নিরাপদ মানহাজ

মুস্তফা হুসাইন

ছয় অন্ধের হাতি দেখার গল্প আমরা সবাই জানি। যেখানে, প্রত্যেক অন্ধই হাতির বিভিন্ন অংশ হাতড়ে খন্ডিত বুঝের আলোকে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত দিচ্ছিল। একই প্রবণতা দেখা যায়, শরীয়াহ ও বাস্তবতার খন্ডিত বুঝের আলোকে ইসলামি সমাধানের একপেশে প্রস্তাবনা পেশকারীদের মাঝে। এর মধ্যে সুফিবাদী চিন্তা দ্বারা আবিষ্ট চিন্তাধারাগুলো তুলনামূলক একটু বেশিই জনপ্রিয়। প্রায় সকল ধারার ইসলামপন্থীদের এটি কম-বেশি মাত্রায় আক্রান্ত করেছে। বিশেষ করে যারা শান্তি ও নিরাপত্তার মসৃণ সড়ক ছেড়ে কণ্টকাকীর্ণ পথে আসতে অনিচ্ছুক, তাদেরকে। মৌলিকভাবে নিরাপদ মানহাজের প্রবক্তাদের প্রধানতম দুটি চিন্তাধারা হলো :

১) ব্যক্তিজীবনে ইসলাম কায়েম করা হলে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে,

২) আত্মত্যাগ ছাড়াই গান্ধিবাদীপন্থায় ইসলামকে প্রবল করা সম্ভব।

সাধারণত এই ঘরানার উলামা, নেতা ও দাঈগণকে প্রায়ই কুফর ও জুলুমের তল্পিবাহকরূপে শাসকগোষ্ঠীর তাবেদারীতে মশগুল হতে দেখা যায়। যদিও, এ মানহাজের অনুসারীদের সবাই দরবারী মানসিকতার নয়; তবে, ফলাফলের মানদন্ডে সকলের অবস্থান প্রায় কাছাকাছি।

[illegible] [illegible] !

আমরা দেখতে পাই, অনেক নেককার লোকেরাও বিপ্লব এবং সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের ক্ষেত্রে সুফিবাদী মানহাজ দ্বারা প্রভাবিত। তারা বলে, আগে আপনার অন্তরে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করুন, তাহলে এমনিতেই জমিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে।

এ কথাটি বর্তমানে কিছু ইসলামি দল এবং সংগঠনেরও স্লোগানে পরিণত হয়েছে। এসব স্লোগানের আড়ালে আত্মশুদ্ধি আর তারবিয়াহর কথা বলে তারা আসলে উম্মাহকে স্থবিরতার মায়াজালে আটকে রাখে। বাস্তবতার দাবি অনুযায়ী প্রকৃত তারবিয়াহ হলো, এ জাতীয় স্লোগানের অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকা। এমন আহ্বানে সাড়া দিয়ে খানকা, বিভিন্ন মসজিদ আর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কমপ্লেক্সে সময়ে সময়ে পরিদর্শন আর নিরাপদ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে কল্পরাজ্যের স্বপ্ন দেখা, মূলত নফসকে ক্যান্সার আক্রান্ত করারই নামান্তর। এমন দাঈ, উলামা বা দলেরা আসলে আত্মশুদ্ধি ও তরবিয়তের বিকৃত সাধনকারী। আফসোসের সাথে বলতে হয়, অনেক সালাফি এবং দেওবন্দি দাবিদার আলেম-দাঈ-জামাতও এই দলে রয়েছে।

অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَ لَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا

> "আমার রাসূলদের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না।" (সূরা ইসরা, ১৭:৭৭)

দুনিয়াবি সকল কিছুতেই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত রীতিনীতি (Universal Law) বিদ্যমান, যা চিরন্তন ও সুসাব্যস্ত। আসবাবের জগতে আল্লাহ তা'আলার রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, যা মহান সত্তার প্রজ্ঞাপূর্ণ নিযামের অন্তর্ভুক্ত। যেমন: পানি ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ফুটতে শুরু করে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় কখনই তা ৮০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ফুটতে শুরু করবে না। আল্লাহ তা'আলার তাওফিকের কথা ভিন্ন। সে বিষয়ে আলোচনা অন্যত্র হতে পারে।

একইভাবে রাষ্ট্র, শাসনকর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব ইত্যাদিও জাগতিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন খাবার-পানীয়-পোশাক ইত্যাদিও জাগতিক বিষয়। এসব ক্ষেত্রে আসবাব গ্রহণ ও ইসলামি শরীয়াহর অনুগমন করা আমাদের দায়িত্ব। রাষ্ট্র একটি জাগতিক বিষয়। দ্বীন বা মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকে ইসলামি মূল্যবোধের উপর, কমিউনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকে কমিউনিজমের উপর কিংবা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর।

যেমনিভাবে, রাষ্ট্র একটি জাগতিক বিষয়, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপায় উপকরণাদিও তদ্রূপ জাগতিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। ইরজায়ী আকিদার প্রভাবিত বাতেনিদের সুরে সুর মিলিয়ে, শুধু অন্তরের শক্তি দিয়ে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো এসকল জামাত বা উলামা ও দাঈদের উপলব্ধি হওয়া প্রয়োজন—

ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা নিশ্চয়ই শারীরিক পরিশ্রমের কাজ, শুধু অন্তরের কাজ নয়। তর্কের খাতিরে আমরা যদি ধরে নিই, এদের দাবি অনুযায়ী ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল, তারপরও কি বাস্তবিকপক্ষে আমরা এই রাষ্ট্রকে পরিচালনা করতে কখনো সক্ষম হব? কখনই না। কারণ এর কোনো প্রস্তুতিই আমাদের ছিল না। একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কঠিন শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনার জন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত ও দীর্ঘ প্রস্তুতির। এর কোনোটি না করেই কীভাবে আপনি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন!

তারা আরো বলে থাকে, 'আপনি আপনার অন্তরে দৃঢ়সংকল্পের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করুন, তারপর দেখবেন বাস্তবে একটি রাষ্ট্র কাঠামো দাঁড়িয়ে গেছে।'

আফসোসের বিষয়—উম্মাহর বৃহৎ একটি অংশ এই অবাস্তব ও হতভাগ্য দাওয়াতের অনুগামী। অথচ অন্যান্য ক্ষেত্রে তাকলিফ নিতে তারা পিছিয়ে থাকে না। ক্ষুধা লাগলে বা পোশাকের প্রয়োজন দেখা দিলে কেউ "অন্তরে রেস্টুরেন্ট বা শপিং সেন্টার প্রতিষ্ঠার" চিন্তা করে না। অথচ শরীয়াহ শাসন প্রতিষ্ঠার মতো মহান বিষয়ের ক্ষেত্রে বালখিল্যতার পরিচয় ঠিকই দেয়া হচ্ছে!

ওয়াল্লাহি! এটি কখনোই শারঈ মানহাজ অনুযায়ী একটি সফল আন্দোলনের আহ্বান হতে পারে না। কারণ এই ভ্রান্ত উক্তিটি আমাদের ভ্রান্ত চিন্তাধারার দিকে যেতে উৎসাহিত করে। সেই ভ্রান্ত বুঝটি হলো, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইসলামি শরীয়াহ কায়েম হয়ে যাওয়া সম্ভব। এমন মানসিকতার ফলে উম্মাহর মাঝে নিষ্ক্রিয় ও জড় চিন্তাধারার ব্যাপকতা কেবল বৃদ্ধিই পেতে থাকবে।

গান্ধিবাদী মানহাজ

আমাদের দেশে ইসলামকে শক্তিশালী করতে আপোষহীন, দৃঢ় ও শক্তিশালী দাওয়াতের বিকল্প নেই। ইসলামের কোনো নিদর্শনের উপর কিংবা মুসলিমদের দ্বীন ও নিরাপত্তার উপর সরাসরি আঘাত আসলে যেহেতু উপযুক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার সুযোগ আপাতত নেই, তাই আপোষহীন আন্দোলন তুলনামূলক অন্যান্য প্রক্রিয়ার চেয়ে অধিক কার্যকর সাব্যস্ত হয়। বিভিন্ন মুসলিমপ্রধান দেশে ইসলামি নেতা ও উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে বহুবার আমরা ইসলাম ও মুসলিমদের উপর আগত আঘাতের প্রতিহতকরণের সফল উদাহরণ দেখেছি। তবে একটু অগ্রসর হওয়ার পর সামান্য চাপের মুখেই দমে গেলে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে, এ কথাও অনস্বীকার্য।

আবার, ইসলাম ও মুসলিমদের নেতারা ঠুনকো কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে মানুষকে নিয়ে রাস্তায় নেমে যাবে, এমন কিছু মোটেও বলা হচ্ছে না। অপ্রাসঙ্গিক কিংবা তুলনামূলক দূর্বল ও অস্পষ্ট কোনো ইস্যুকে কেন্দ্র করেও মুসলিমরা আন্দোলিত হবে, এমনও কাম্য নয়।

কিন্তু ইসলাম ও মুসলিমদের উপর সরাসরি কোনো আঘাত যদি আসে? সেক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য কি দৃশ্যমান ও শক্তিশালী অবস্থানগ্রহণের মাধ্যমে তা প্রতিহত করার চেষ্টা করা উচিত হবে না? যদি ইসলাম, আল্লাহর কিতাব ও রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আক্রমণের মতো বিষয় সংঘটিত হয়? যদি দ্বীনের প্রকাশ্য চর্চার উপর আঘাত আসে? যদি ঢালাওভাবে মুসলিমদের সম্পদ ও মৌলিক চাহিদা হরণ করা হয়?

এক্ষেত্রে সামর্থ্য অনুযায়ী দৃশ্যমান আন্দোলন ও সামাজিক শক্তি গড়ে তোলাই হবে জরুরী। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার চেয়ে যে এভাবেই অধিক সফলতা আসা সম্ভব ইতিপূর্বে মুফতি আমিনি (রহ.), আল্লামা আহমাদ শফি (রহ.), আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী (রহ.) -সহ অনেকে প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন। ৫ই মে'র আন্দোলন, কিংবা ফিলিস্তিনের বীর মুসলিমদের ইন্তিফাদার উদাহরণ হবে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক।

ইন্তিফাদা বা ৫ই মে'র মতো তীব্র আন্দোলনের ফসল পূর্ণভাবে মুসলিমরা অর্জন না করতেও পারলেও, মুসলিমদের দ্বীন ও সম্মানের নিরাপত্তা অনেকাংশেই যে এ আন্দোলনগুলোর মাধ্যমে হেফাজত হয়েছে তা স্বীকার করতেই হয়।

কিন্তু এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে, ইসলামকেন্দ্রিক কার্যকর আপোষহীন আন্দোলনের বদলে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে সন্তুষ্ট হতে আহ্বান জানিয়ে থাকেন অনেকেই। এতেই নাকি ক্রমান্বয়ে ইসলামের প্রভাব নিশ্চিত হবে!

এই ধরণের অবস্থনের প্রবক্তারা সম্ভবত মনে করছেন, আন্দোলনের পর গণবন্দীত্ব বা নিপীড়নের মতো চাপ আসেব, যার ফলে সুদূরপ্রসারী ইসলামি প্রকল্প বিনষ্ট হবে। শরীয়াহসম্মত নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কল্যাণকর প্রভাব রয়েছে, আর তা প্রয়োজনও বটে।

কিন্তু ঢালাওভাবে শান্তিপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাঝে ইসলামের দাওয়াহ, ফিকর ও মেহনতকে সীমাবদ্ধ করার আহ্বান সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত ক্ষতিকরই সাব্যস্ত হবে সম্ভবত। গান্ধীবাদি প্রকল্পের অনুসরণে দুঃখজনকভাবে এ-ও বলা হচ্ছে—

1) বামপন্থীদের প্রভাব শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ধীরে ধীরে পোক্ত হয়েছে

2) চলমান ব্যবস্থায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমেই ইসলামের জন্য দাবিদাওয়া আদায় করে নিতে হবে!

কিছুটা তিক্ত লাগলেও বলতে হচ্ছে, এমন আশ্চর্য ও অনুমাননির্ভর বক্তব্য প্রকাশ্যে আত্মবিশ্বাসের সাথে কিভাবে উচ্চারণ করা হয় আমার বোধগম্য নয়। ইতিহাস ও বাস্তবতা এমন সাক্ষ্য দেয় না। গণতান্ত্রিক রাজনীতির চোরাবালিতে আটকে যাওয়া কিংবা ব্যক্তিগত নিরাপত্তাজনিত অতিভীতির আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া, শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখপাত্ররা ভুলে যান যে, জালিম কেবল শক্তিশালীর সাথেই আপোষ করে। ভেড়াকে কেউ খাঁচায় আটকায় না, সিংহকেই আটকায়।

বাস্তবতা হল, সেক্যুলার আন্দোলনগুলোর ব্যাপারে প্রাথমিক পর্যায়ের ধারণা রাখা ব্যক্তির পক্ষেও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বৈধতা আদায়ে এজাতীয় কথা বলা সম্ভব নয়। বামপন্থা তথা সমাজতান্ত্রিক বা সেক্যুলার রাজনীতির ইতিহাসের কোনো অংশেই এ অবস্থানের পক্ষে দলীল খুঁজে পাওয়া সম্ভব না। তবে, তাদের সুগারকোটেড মিথ্যায় অন্ধবিশ্বাস থাকলে ভিন্ন কথা। আসলে ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সংকটের ফলে, বরাবরই তাদের সকল চেষ্টা ও ত্যাগের ফলাফল ঘরে তুলেছে জাতীয়তাবাদী সেক্যুলার দলগুলো!

[২]

বলা হচ্ছে, 'শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে সীমাবদ্ধ থাকুন। সময় নিন। শক্তিশালী হোন। বামপন্থীদের বদলে রাষ্ট্রযন্ত্রে আপনার ইচ্ছা অনিচ্ছাই তখন বেশি প্রতিফলিত হবে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এটাই নিয়ম।'

অথচ বামদের ইতিহাস বলে অন্য কথা।

বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া অস্তিত্ব লাভ করে ১৯০৫, ১৯১৭ এর ফেব্রুয়ারি ও অক্টোবরের রক্তাক্ত আন্দোলনের মাধ্যমে। এছাড়াও চীন, কিউবা, ভিয়েতনাম, এংগোলাসহ বহু দেশে, তীব্র আন্দোলন ও সংঘাতের মধ্য দিয়েই কমিউনিস্ট বিপ্লবী দলগুলো আস্তে আস্তে জনসমর্থন আর তারপর দীর্ঘমেয়াদী সশস্ত্র যুদ্ধের সক্ষমতা অর্জন করে।

মিশর, সিরিয়া বা ইয়েমেনের মতো মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতেও কমিউনিস্টদের ক্ষমতায় আসার গতিপথ লক্ষ্য করলও, নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়া চোখে পড়ে না। আর সোভিয়েত রাশিয়া, চীন ও কিউবার পরের বাকী রাষ্ট্রগুলোতে কমিউনিস্ট বা বামপন্থীদের প্রভাব ব্যাপকতা লাভ করে সোভিয়েত রাশিয়ার মদদে। সোভিয়েত রাশিয়ার বার্ষিক কংগ্রেসে দুনিয়ার তাবৎ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রপ্রধান আর কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা জমায়েত হতো। নিজ নিজ দেশে করণীয় কর্তব্যের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা লাভ করতো। এখানে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের তেমন কোনো ভূমিকা নেই।

সোভিয়েত বা চীনের প্রভাব ব্যতীত বামপন্থীদের জাতীয় পর্যায়ে নিয়ামক হবার বাকি দিকগুলো আসুন লক্ষ্য করা যাক। উদাহরণ হিসেবে ভারত ও বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ থাকা যেতে পারে। ভারতে চারু মজুমদারের নকশালপন্থীদের কঠিন সংগ্রাম, শাসকপন্থীদের কমিউনিস্টদের সাথে দর কষাকষিতে বাধ্য করে। ইলা মিত্রের তেভাগা আন্দোলনও তথাকথিত 'শান্তিপূর্ণ' বা 'নিয়মতান্ত্রিক' কিছু ছিল না। শহরাঞ্চলে সরকারের সাথে ক্রমাগত তীব্র আদর্শিক দ্বন্দ্বই কমিউনিস্টদের আদর্শকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করে তোলে। যার ফলাফল হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে এক পর্যায়ে সিপিআই(এম) তথা কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্ক্সবাদী) টানা ৪০ বছর ক্ষমতায় থাকে।

বাংলাদেশে ৭১ পরবর্তী সময়ে সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে জাসদ একাধারে মুজিব, খালিদ মোশাররফ ও জিয়ার শাসনামলে এতবেশি সংঘাতে লিপ্ত হয় যে, জাসদ পরিণত হয় সরকারবিরোধী শক্তির আইকনে। ১৯৭৪ এর ১৭ই মার্চে তৎকালীন বেইলি রোডে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলির বাড়ি অবরোধে এগিয়ে যায় জাসদ। নাগরিক ঐক্যের আহবায়ক, প্রাক্তন জাসদ নেতা মাহমুদুর রহমান মান্নার বক্তব্যানুযায়ী, সেইদিন প্রথম গুলি ছোঁড়ে জাসদ নেতা ইনু, যাতে আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে। তারপর পুলিশের গুলিতে প্রায় ৫০ এর মতো জাসদকর্মী নিহত হয়। কঠিন ক্র্যাকডাউনের পরেও জাসদ নেতারা হতোদ্যোম না হয়ে, এই ঘটনাকে কিউবাতে ক্যাস্ট্রোর মনকাডা ব্যারাক আক্রমণের সাথে তুলনা করে আন্দোলনের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি করে।

উল্লেখ্য, ১৯৫২ সালে ফিদেল ক্যাস্ট্রো শ' খানেক অনুসারী নিয়ে মনকাডা দূর্গে সশস্ত্র আক্রমণ করে। এতে অনেকেই নিহত হয়। পরিনামে ক্যাস্ট্রোর ১৫ বছর সাজা হয়।

ইতিহাসের জ্ঞান রাখেন তাদের সকলেই জানেন, এদেশে বামপন্থী রাজনীতির গ্রহণযোগ্যতা আদায়ে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে জাসদ। ৭২ থেকে ৮০ পর্যন্ত জাসদ ব্যতীত অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের ভূমিকা চোখে পড়ার মত ছিল না। যদি ১৫ই আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানে সরকার পতন না হতো, কিংবা কর্নেল তাহের ৭ই নভেম্বরের পর আবার ক্যু এর চেষ্টা না করতো, জাসদের প্রভাব ভয়াবহ আকার ধারণ করতো। এছাড়া সিপিবি ও তাদের অঙ্গ সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নেরও রয়েছে তীব্র আন্দোলন ও সংঘাতের রক্তাক্ত ইতিহাস। আর সিরাজ শিকদারের 'পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি'র কথা কে না জানে। তাই বর্তমানে বাম দল বা ব্যক্তিত্বের প্রভাব কেবল বর্তমানের প্রেসক্লাবের সামনের শান্তিপূর্ণ অবস্থান বা বয়ান-বিবৃতির ফল, এমন চিন্তাধারা ইতিহাস সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা অথবা মানসিক বৈকল্যই নির্দেশ করে।

১৯৯১ এ সোভিয়েত রাশিয়ার পতন, এবং চীন ও ভিয়েতনামের পুঁজিবাদের দিকে অগ্রসর হওয়ার পরও, বিভিন্ন দেশের বাম সংগঠনগুলো এখনো পারস্পরিক লিয়াজো বজায় রেখেই চলে। ফলে মিডিয়া, সংবাদপত্র বা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উইংয়ের সমর্থন আগের মতো না থাকলেও, বাম সংগঠনগুলো মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রগুলোতে মোটামুটি একটা মাত্রায় কিছুটা প্রভাব এখনো ধরে রেখেছে। যার ফলে রাষ্ট্রযন্ত্র এদের কিছুটা হলেও মূল্যায়ন করতে বাধ্য হয়। এটাই বামপন্থীদের প্রভাবের মূল কারণ। এর পেছনে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, হাফ ডজন লোকের মানববন্ধন কিংবা ডিভোর্সি আর লম্পট সুশীল সমাজের গালভরা বিবৃতির ভূমিকা তেমন

নেই বললেই চলে!

[৩]

শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি-দাওয়া আদায়ের পক্ষাবলম্বনকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটা কথা বলতে চাই। ৯০-এর দশকে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে যে পরিমাণ হতাহত হয়েছে, এমনটা সশস্ত্র সংগঠনগুলোর হাতেও হয়নি। শুধুমাত্র সরকারের বেঁধে দেয়া নিয়মে সীমাবদ্ধ পোষা রাজনীতিতে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো রাজনীতিবিদরা অগ্রসর হয় না।

'৬০-এর দশকে শেখ মুজিব এত বেশি বন্দী হতো যে, জেলের জন্য সার্বক্ষনিক একটা ব্যাগ তার প্রস্তুত থাকতো। আওয়ামি লীগের এমন কোনো নেতা ছিল না, যে নিদেনপক্ষে কয়েক দফা ও কয়েক বছর জেল খাটেনি। অন্যদিকে আমাদের আন্দোলনের রোডম্যাপ বর্ণনাকারীদের এ ব্যাপারে দৃঢ়তা দূরে থাকুক, কারাগারকে তারা কেমন যেন কবরের মতো মনে করে চলেছেন।

তারা বলছেন—আরো অনেক তাজা প্রাণ ঝরে যেতে পারে। গ্রেফতার হতে পারে সম্ভাবনাময় বাকিসব ধর্মীয় নেতারা। আমরা ক্ষমতা ও ধর্মীয় প্রভাব বিস্তারের দৌড়ে পিছিয়ে যেতে পারি অন্তত ত্রিশ বিশ বছর। তাই কদম ফেলতে হবে হিসেব করে। আফসোস!

অথচ ক্ষমতা ও আদর্শের প্রভাব নষ্ট হচ্ছে পশ্চাদপদ মানসিকতার জন্যই, বন্দীত্ব বা শাহাদাতের কারণে না। ইসলাম ও ইতিহাসের আলোকে সার্বজনীন বাস্তবতা এটাই যে, নিজেদের আদর্শের জন্য অথবা বিপ্লবের লক্ষ্য হাসিলের জন্য সফল বিপ্লবী শ্রেণীটি এত বেশি ত্যাগ স্বীকার করে এক পর্যায়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তাদের এই ত্যাগকে সমর্থন দিতে শুরু করে। এভাবে তারদের ক্ষমতা ও প্রভাব সুসংহত হয়।

তাই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন একটি অলীক বস্তু। ইতিহাস কখনো এর সত্যতা ও সফলতার নজির হাজির করতে পারবে না। হ্যাঁ, রাজনীতিবিদরা প্রায়ই "শান্তিপূর্ণ আন্দোলন" এর কথা বলে। তবে এটা একটি কৌশলগত উক্তি ছাড়া কিছুই না। তা না হলে, তাদের আন্দোলনের দিনগুলোতে পেট্রোল, ককটেল আর টায়ার কি স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপস্থিত হয়?

বাস্তবতা হল, যে কোনো আন্দোলনের উদ্দেশ্যই থাকে বিপরীত পক্ষকে চাপে ফেলে দাবি আদায় করা অথবা পরিবর্তনের পথ পরিস্কার করা। গান্ধীর অহিংস নীতিও এর ব্যতিক্রম ছিল না। খেলাফত আন্দোলন, সত্যাগ্রহ বা অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধী কিছুটা হলেও ব্রিটিশরাজকে প্রশাসনিক চাপের মুখোমুখি করেছিল।

আমরা সবাই জানি লাখ লাখ ইসলামপন্থীদের সমাবেশ হলেও মিডিয়া সেটাকে সঠিকভাবে কাভারেজ দেবে না, বৈদেশিক কোনো লবি সমর্থন দেবে না। তাহলে কিভাবে আশা করা যায় যে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে নূন্যতম ফায়দা মিলবে? আর কিভাবেই বা একে হাতিয়ার হিসেবে নেয়া যায়?

আর নিজেদের দূর্বলতা ও নিস্ক্রিয়তার বৈধতা আদায়ে, বিপ্লবী জনসাধারণকে তাওহিদের উত্তাপ থেকে দূরে ঠেলে দেয়ারও বা যৌক্তিকতা কী? আমরা যদি কোনো সামগ্রিক পরিবর্তন না-ও চাই, সেই ক্ষেত্রেও প্রেশার পলিটিক্সের মাধ্যমে আংশিক পরিবর্তন ও প্রতিরোধের জন্যও তীব্র আন্দোলন অত্যন্ত জরুরী অনুষঙ্গ।

তাই না বুঝে শান্তিপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা বলাটা আসলে আন্দোলন বা বিক্ষোভের ব্যাপারে সঠিক বুঝের অভাব এবং এ বিষয়ে গতানুগতিক চিন্তাধারার ব্যাপারেও ত্রুটিযুক্ত বুঝ থাকার পরিচায়ক।